বুদ্ধদেব বসু

তিথিডোর

KOBI PROKASHANI

তিথিডোর
বুদ্ধদেব বসু

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/4 আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৬৫০ টাকা

Tithidore by Buddhadeva Bose Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: June 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 650 Taka RS: 650 US 35 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95043-7-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচিপত্র

প্রথম শাড়ি প্রথম শ্রাবণ ৭
করুণ রঙিন পথ ৯৭
যবনিকা কম্পমান ২২১

প্রথম শাড়ি প্রথম শ্রাবণ

রাজেনবাবু মানুষটি একটু শৌখিন। শৌখিন মানে বাবু নয়। হাঁটুর কাছে কাপ তুলে, দুহাতে দুই ঝুলি নিয়ে বাজার করে আসতে আপত্তি নেই তাঁর; কিন্তু শোবার সময় বালিশে একটু সুগন্ধি চাই। এক জামা পরে সপ্তাহের ছদিন আপিস করবেন, এদিকে কাচের গেলাসে ছাড়া জল খাবেন না। ঠিকে-ঝি কামাই করলে রাত থাকতে বিছানা ছেড়ে উনুন ধরিয়ে রাখবেন, তারপর বারান্দার ভাঙা তক্তায় খালি পায়ে বসে গুনগুন করবেন—ভৈরবী কি যোগিয়া।

পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে, বাপের বাড়িতে এক বছর কাটিয়ে শিশিরকণা প্রথম যখন স্বামীর ঘর করতে এলেন, স্বামীর এসব ছোটখাটো শখগুলি তাঁর মনে বিশুদ্ধ কৌতুক জাগিয়েছিল। এমনকি এর কিঞ্চিৎ প্রশ্রয়ও তিনি দিয়েছিলেন বিছানার তলায় অগুরুর শিশি লুকিয়ে রেখে—তার চেয়েও বেশি, ঠিকে-ঝির সাহায্যে সংগৃহীত কয়েকটি পথে-ঝরা বকুল কোনো রাত্রে নিজের আঁচলে বেঁধে নিয়ে। সুগন্ধ ভালো, সুগন্ধের উৎসটা আরও ভালো হতে দোষ কী? কয়েক মাস পরে শিশিরকণা যখন অন্তঃসত্ত্বা হলেন, আর রাজেনবাবু বললেন—বেশ হলো, ছোট্ট ফুটফুটে একটা মেয়ে হবে, বেশ—তখন স্বামীর এই নতুন শখটিতে বেশি সুখী না-হয়ে তিনি বললেন—কেন, মেয়ে কেন?

—ছেলে হলে তো শুধু হাফপ্যান্ট আর ডান্ডাগুলি! আর মেয়ে? রং-বেরঙের ফ্রক, রিবন, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল—আর একটু বড় হলে তো কথাই নেই। কিন্তু স্বজাতির সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনায় শিশিরকণাকে বিশেষ উৎফুল্ল দেখা গেল না। যেরকম কথা নিজের মার মুখে অনেকবার তিনি শুনেছেন, তারই পুনরুক্তি করলেন এই ভাবী মা—ফ্রক, রিবন, বাঃ! মেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা তো ভালোই!

তা তুমি যা-ই বলো, একটা মেয়ে থাকলে ঘর আলো।

কয়েক মাস পরে আলো হলো ঘর। আর তিন দিন পরে রাজেনবাবু তাঁর শৌখিনতার আর-একটি নমুনা দেখালেন। মেয়ের নাম তিনি রাখলেন—শ্বেতা।—না বাবা, আঁতুড়ঘরের দরজায় বসে বলে উঠলেন শিশিরকণার বিধবা পিসিমা—সীতা নাম রেখো না, বড় দুঃখিনী সীতা। সীতা নয়, শ্বেতা—গম্ভীরভাবে রাজেনবাবু বললেন, তালব্য-শ আর ব-ফলা দুটোই স্পষ্ট উচ্চারণ করে।

ওসব বিলিতি নাম আমাদের মুখে তো আসবে না, তবে হ্যাঁ—মেয়ে তোমার মেমের মতোই রূপসী হবে।—বিলিতি নয় তো—রাজেনবাবুর কথা কেটে দিয়ে

আর-একটি কণ্ঠস্বর উঠল আঁতুড়ঘরের ভিতর থেকে—ওঁর কথায় তুমি আবার কান দাও পিসিমা, ওঁর তো ঐরকমই! মেয়ের নাম আমি মঞ্জু রেখেছি। শেষের কথাটি শিশিরকণা একটু চেঁচিয়ে বললেন, যাতে যথাস্থানে নির্ভুলভাবে পৌঁছয়। পৌঁছল, কিন্তু যথাস্থানটি অবিচলিত। মাসখানেকের মধ্যে একটা নামের লড়াই লেগে গেল বাড়িতে। মেয়েকে বুকে চাপড়ে-চাপড়ে আদর করেন শিশিরকণা—মঞ্জু—মঞ্জুল—মঞ্জুলি-ই। আর রাজেনবাবু ঠিক সুরে সুর মিলিয়ে বলে ওঠেন—মঞ্জু—ঝুমঝুম—লজনচু—ষ! তারপর কাছে এসে মেয়ের গালে একটু আঙুল ছুঁইয়ে ডাকেন—শ্বেতা! চোখের পাতা মিটমিট করেন কন্যা, যেন এই নামই তাঁর পছন্দ। তা হতেই পারে, যা ফুটফুটে ফর্সা!

প্রথম সন্তান যুবক পিতার কণ্টক, এ-কথা যাঁরা বলেন, নিশ্চয়ই তাঁরা রাজেনবাবুকে দ্যাখেননি। হাঁটু ঝেঁকে-ঝেঁকে মেয়েকে ঘুম পাড়াচ্ছেন তিনি, বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছেন, কোলে নিয়ে বেড়াচ্ছেন বিকেলে, রাত্তিরে বদলে দিচ্ছেন কাঁথা। প্রথম ছ-মাসের মধ্যে একটি রাত্রিও ঘুমের ব্যাঘাত হলো না নতুন মার, বাঙালি পরিবারের পক্ষে যার তুল্য আশ্চর্য কথা আর নেই। কিন্তু এ-সুখের একটি দাম দিতে হলো। শ্বেতার জামাটা কোথায়—শ্বেতার পাউডারটা দাও—শ্বেতা তো খুব ঘুমুচ্ছে আজ—সবসময় এই শুনতে-শুনতে শিশিরকণাও মাঝে-মাঝে শ্বেতা বলে ফেলতে লাগলেন। প্রথমে ঠাট্টা করে 'তোমার শ্বেতা'। যেমন—তোমার শ্বেতার তো রূপের খ্যাতি হচ্ছে খুব, কি—শ্বেতা কীরকম হাসে দেখেছ? তারপর শুধুই শ্বেতা। সীতা কিংবা সীতুও নয়, একেবারেই শ্বেতা। মঞ্জু যুদ্ধে হেরে দেশান্তরী হলো, রাজেনবাবু মহৎ যোদ্ধার মতো নিজের জয় মেনে নিলেন সবিনয়ে।

দেড় বছর পরে আর-একটি মেয়ে যখন জন্মাল, রাজেনবাবু তক্ষুনি তার নাম দিলেন মহাশ্বেতা। তৃতীয় কন্যাটি অতদিনও সবুর করল না। মহাশ্বেতার সঙ্গে চৌদ্দ মাসের ব্যবধান রেখে শিশিরকণার কোলে এলো সরস্বতী।

থাক, থাক, আর সোহাগ করে নাম দিতে হবে না—শিশিরকণা বলে উঠলেন।

নাম তো একটা চাই—

ছাই!—নিজের অজান্তে শিশিরকণা একটা পদ্য রচনা করে ফেলেন। দ্বিতীয়বারে তাঁর বিশ্বাস ছিল, ছেলে হবে। তবু মহাশ্বেতাকে সহ্য করেছিলেন ভবিষ্যতের আশায়। কিন্তু এবারেও! তিন-তিনটে মেয়ে! তাঁর বিরক্তি, তাঁর বিক্ষোভ আর তিনি গোপন রাখতে পারলেন না। রাজেনবাবু বললেন—কী সুন্দর চুল হয়েছে সরস্বতীর!

হয়েছে! হয়েছে! যাও এখন—বলে শিশিরকণা নবজাতার একমাথা কোঁকড়া চুলের দিকে একটু তাকালেন আড়চোখে। কেন, তিনটি সুন্দর-সুন্দর মেয়ে, ভালো লাগে না তোমার?

ও, এখনও মেয়ের শখ মেটেনি দেখছি! তোমার জন্যই, তোমার জন্যই তো খালি-খালি মেয়ে হচ্ছে আমার, আর মেয়ের নাম মুখেও এনো না—কিন্তু মুখে না আনলে হবে কী, রাজেনবাবুর মনের এই একটি শখ ভালোরকম মিটিয়ে দিতে ভাগ্যবিধাতার আশ্চর্য তৎপরতা দেখা গেল। বছর সাতেক চুপচাপ থেকে শিশিরকণা হঠাৎ আবার উঠে-পড়ে লাগলেন। সতেরো বছরের বিবাহিত জীবনে পঞ্চ-কন্যার পিতা হলেন রাজেনবাবু। এক ফাঁকে একটি ছেলেও অবশ্য এসে গেল। বোনেদের সঙ্গে তার পার্থক্য একেবারে লাল কালিতে টেনে দিয়ে রাজেনবাবু তার নাম রাখলেন বিজন। সে কী! শিশিরকণার চোখ উঠল কপালে—মেয়েদের নামের জাঁকজমকে তো পাড়ার লোক অস্থির, আর ছেলেটা বিজন!

পুরুষের সাধারণ নামই ভালো। কী হবে না হবে জানি না তো, মিছিমিছি একটা লম্বা-চওড়া নাম দিয়ে...

আর মেয়েরাই বা তোমার কোন রাজকন্যা?

তা আমার মেয়ে যখন, রাজকন্যা তো বলাই যায়।

তাহলে ছেলেই বা রাজপুত্র নয় কেন?

তা বলে বিক্রমাদিত্য তো নাম রাখা যায় না!

এত কষ্টের, এত দিনের চেষ্টার একটা মাত্র ছেলে, তার সম্বন্ধে স্বামীর এই অবহেলা শিশিরকণার সহ্য হলো না। জ্বলে উঠে বললেন—মেয়ে-মেয়ে করে তুমি পাগল, মেয়ের হাতে তোমার অনেক লাঞ্ছনা আছে বলে দিচ্ছি। সত্যি, মেয়েদের সম্বন্ধে রাজেনবাবু একটু বেশিই মুগ্ধ। আর কপালও তাঁর—পাঁচটি মেয়ের যেকোনোটির দিকে তাকালে চোখ ফেরে না। শিশিরকণা সেকেলে ধরনের সুন্দরী—ফর্সা রং, টানা-টানা নাক-চোখ, রাজেনবাবুও দেখতে ভালোই। কিন্তু তাই বলে এত রূপ হবে প্রত্যেকটি মেয়ের, এরকম তো কথা ছিল না। না-ও তো হতে পারত। আর শুধু কি রূপ!

অবশ্য পাঁচটি মেয়েকে একসঙ্গে বাড়িতে পাওয়া রাজেনবাবুর ভাগ্যে ঘটে উঠল না। শ্বেতার বিয়ে হয়ে গেল স্বাতী জন্মাবার আগেই। শিশিরকণার বিয়ে হয়েছিল একটু বেশি বয়সে, তাঁর সময়ের পক্ষে বেশি। স্পষ্ট মনে পড়ে অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সুখী ছিলেন না, বিয়ে হয়ে যেন বাঁচলেন। বড় মেয়ে পনেরোয় পড়া মাত্র, তাই তার বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। রূপের জোরে পাত্র জুটল মৈমনসিং-এর এক ছোটখাটো জমিদারের পুত্র। ছেলের ফটোগ্রাফ দেখে শিশিরকণা পছন্দ করলেন। ছেলের বাপ পছন্দ করলেন সশরীরে পাত্রীকে দেখে। বিয়ে হয়ে গেল। স্বাতী তখন মাতৃগর্ভে সাত মাসের। ঐ অবস্থায় নবজামাতার সামনে লজ্জাই করছিল শিশিরকণার, কিন্তু উপায় কী?

বিজন জন্মেছে দু-বছর আগে। শুধুই কতগুলো বোনের মধ্যে বড় হয়ে উঠতে তার ভালো লাগবে না বলে সে-ই ডেকে আনছে একটি ভাইকে, মনে-মনে এই

রকম যুক্তি প্রয়োগ করছিলেন শিশিরকণা। খাটল না...আবারও মেয়ে। তেরো বছরের মহাশ্বেতা, বারো বছরের সরস্বতী আর পাঁচ বছরের শাশ্বতী যখন আঁতুড়ঘরের দরজায় ভিড় করল, নেহাতই শোয়া থেকে উঠতে পারছিলেন না বলে, নয়তো ঠিক ওদের গালে ঠাস ঠাস চড় বসিয়ে দিতেন। রাজেনবাবু বললেন—বেশ হলো, এক মেয়ে গেল শ্বশুরবাড়ি, আরেক মেয়ে এলো। শিশিরকণা চোখ বুজে মনে-মনে বললেন—হে ঈশ্বর, আর যেন কখনো আমার কিছু না হয়।

ভাগ্যবিধাতার কানে পৌঁছল এই প্রার্থনা। কিন্তু একটু ভুল করে, এরকম ভুল দেবতাটি প্রায়ই করে থাকেন। কিছুটা বেশিই মঞ্জুর করে ফেলেন তিনি। স্বাতীর জন্মের কয়েক মাস পর থেকে একটু-একটু করে বোঝা যেতে লাগল যে শিশিরকণা শুধু-যে আর নতুন প্রাণ পৃথিবীতে আনতে পারবেন না তা নয়, তাঁর নিজের প্রাণই যেন থরথর করছে ঝরে পড়ার জন্য। মাস কাটল, বছর কাটল, শরীর আর সারে না। ডাক্তারে বিরক্ত হয়ে রাজেনবাবু ছুটি নিলেন দু-মাসের। অনেক খরচ করে মস্ত পরিবারটি নিয়ে মিহিজামে এলেন। শিশিরকণা অনেকটা সেরে উঠলেন, কলকাতায় ফিরেও বেশ ভালো থাকলেন কিছুদিন। আবার আস্তে-আস্তে খারাপ হলো, আবার শয্যা নিতে হলো। এ অবস্থাতেই কায়েমি হলেন তিনি। মাঝে-মাঝে ডাক্তার আসে, চিকিৎসায় উপকারও হয় তারপর। ডাক্তার যেই বলে—এইবার আপনি ঠিক সেরে উঠছেন, তখনই নতুন কোনো উপসর্গ দেখা দেয়। মাঝে-মাঝে এমনিতেই বেশ ভালো থাকেন, আবার শুয়ে থাকতে হয় দিন পনেরো। রাজেনবাবু নিয়ম করে বছরে একবার কলকাতার বাইরে যেতে লাগলেন সক্কলকে নিয়ে। সমুদ্র, পাহাড়, শুকনো হাওয়া, দুধকুণ্ডের জল সবই হলো, কিন্তু কীসের কী! হঠাৎ একদিন দেখা যায় শিশিরকণা কিছুই খাচ্ছেন না, কেমন চুপচাপ হয়ে আছেন। আবার বিছানা। বিশৃঙ্খলা এলো সংসারে, অকুলোন ঘটল। শুয়ে-শুয়ে অসহায় চোখে শিশিরকণা তাকিয়ে দ্যাখেন চাকরদের চুরি, মেয়েদের অপব্যয়, ছেলেটার হতচ্ছাড়া চেহারা। সংসার! দিনে-দিনে গড়েছেন একে, তিলে-তিলে ভরেছেন, সকল গহ্বর পূর্ণ করেছেন তাঁর শরীর দিয়ে। শরীর ছাড়া আর কী আছে মেয়েদের? পুরুষ কত কিছু পারে তার শক্তি, তার সাহস, তার অর্থ দিয়ে। মেয়েরা যা পারে শুধু শরীর দিয়েই পারে। স্বামীর এই আয় আর কবে থেকে, তাঁরা তো গরিবই ছিলেন, অথচ কখনো এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য কি ঘটতে দিয়েছেন? কখনো কি ওরা একটা ময়লা জামা পরেছে, না খারাপ খেয়েছে, নাকি ওঁকেই কখনো শুনতে হয়েছে যে হাতে টাকা নেই?

ক্ষীণ কণ্ঠ যথাসম্ভব চড়িয়ে তিনি ডাকলেন—মহাশ্বেতা! সরস্বতী! মহাশ্বেতা! কী-নামই রেখেছে বাপু! কোনো রকমে যে একটু ছোট করে নিয়ে ডাকব, এত বছরের চেষ্টায় তা পারলাম না। মহাশ্বেতা ঘরে এসে বলল—কেন মা?

বিজুটা কীরকম নোংরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখিস না তোরা! বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দে-না ওকে একটু পরিষ্কার করে।

বাথরুমে সরস্বতী, মা।

তবে নিচে নিয়ে যা কলতলায়। আলমারি খুলে দ্যাখ তো ওর জামা-কাপড় কী আছে। মহাশ্বেতা আলমারি খুলে একটি ভেলভেটের নিকারবোকার বের করল।

বুদ্ধি তোর! এই গরমে—! আর এটা ছোটও হয়ে গেছে ওর। একটা সাদা প্যান্ট আর একটা গেঞ্জি বের কর। কিন্তু খুঁজে-খুঁজে গেঞ্জি পাওয়া গেল না কোথাও। মহাশ্বেতার মুখ লাল হলো, কপাল ঘেমে উঠল, একটা টানতে গিয়ে তিনটি ফেলল মেঝেতে। শিশিরকণা অনেক ধৈর্য খাটিয়ে বললেন—ঐ পপলিনের শার্টটা—আঃ, ভালো করে গুছিয়ে রাখ, আর আঁচলটা তোল না গায়ে! ভাইয়ের শার্ট-প্যান্ট নিয়ে মহাশ্বেতা একটু দ্রুত ভঙ্গিতেই বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল—বিজু আসছে না, মা।

আসছে না আবার কী! জোর করে ধরে নিয়ে যা।

আমি কি ওর সঙ্গে জোরে পারি নাকি?

না, এত বড় মেয়ে, ঐটুকু ছেলের সঙ্গে তুমি পারো না!

বিজু বড্ড মারে। শিশিরকণা হেসে বললেন—মার না-খেলে আর দিদি কী? আর এত বড় মস্ত মার মতো দিদি! দুই ঠোঁটে একটা বিরক্তির শব্দ করে মহাশ্বেতা মাথা ঝেঁকে উঠল। কিছু বললেই এরকম করিস কেন রে?

আমি পড়ব না? পরীক্ষা না আমার? মহাশ্বেতার গলা শুনে শিশিরকণা স্তম্ভিত হলেন। মার কথার উত্তরে এরকম গলা বের করা যায়, সেটা কল্পনাতীত ছিল তাঁদের ছেলেবেলায়। চুপ করে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন—আচ্ছা যা, পড় গিয়ে। তক্ষুনি অন্তর্হিত হলো মহাশ্বেতা। বাঁচল যেন। সেদিনই সন্ধেবেলায় শিশিরকণা স্বামীকে বললেন—রাজকন্যাদের জন্য রাজপুত্র খুঁজতে লেগে যাও এবার।

—হবে, হবে, তুমি সেরে ওঠো তো।

—আমি যা সারব তা জানি! একসঙ্গেই ব্যবস্থা কোরো দুজনের, খরচও বাঁচবে, আমিও বাঁচব।

—এত ব্যস্ত কী! ছেলেমানুষ, ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে পড়বে, আজকাল তো আর সে-দিন নেই যে—

সে-দিন নেই মানে—মৃদু স্বরে কিন্তু খুব স্পষ্ট করে শিশিরকণা বললেন—মেয়েদের বিয়ে হতে পারছে না, তাই ও নিয়ে কেউ আর কিছু বলছে না আজকাল; কিন্তু যৌবন তো আর দেরি করে আসছে না তাই বলে।

—ও-রোগের একমাত্র চিকিৎসা বুঝি বিয়ে? একটু হাসলেন রাজেনবাবু।

ঠাট্টা কী, ঠিকই তো, তোমার মেয়েদের তো আর অন্যদের অবস্থা নয়। রূপ আছে, তরে যাবে। ঠাট্টার সুরটা বজায় রেখে রাজেনবাবু বললেন—তা পাণিপ্রার্থী রাজপুত্রেরাই আসবে কদিন পরে।

—দু-একটি এসে গেছে, মনে হচ্ছে। ও-ঘরে এত হইচই কীসের?

খুব আড্ডা জমিয়েছে ওরা।

কারা?

কারা আবার। মহাশ্বেতা, সরস্বতী—

আরও কার গলা পাচ্ছি যেন?

ও-তো অরুণ।

অরুণ? শিশিরকণা ভুরু কুঁচকোলেন।

আহা, অরুণকে ভুলে গেলে? শ্বেতার দেওর, সেই-যে ডাক্তারি পড়ে—

অরুণ এসেছে নাকি? কেন?

প্রায়ই আসে তো।

প্রায়ই আসে? আমার সঙ্গে তো দেখা করে না।

তোমাকে আর বিরক্ত করে না। জানে তো, শরীর ভালো নেই।

তোমার সঙ্গে?

আহা, আমার সঙ্গে আবার আলাদা করে দেখা করবে কী! ছেলেমানুষ সবাই, সন্ধেবেলা একসঙ্গে বসে গল্প-টল্প করে, আমি আর ও-ঘরে যাই-টাই না। উঁচু-করা বালিশের ঢালু থেকে শিশিরকণার টানা-টানা ক্লান্ত দুটি চোখ স্বামীর মুখের ওপর স্তব্ধ হলো।

এতদিন আমাকে বলোনি এ-কথা!

আহা, এ আবার একটা—

তুমি কী!—শিশিরকণা সোজা হয়ে উঠে বসলেন—আমি মরে গেলে উপায় হবে কী তোমার?

যত বাজে— !

অরুণকে একটু ডেকে দাও আমার কাছে।

—পাগল নাকি! কুটুম্ব মানুষ—

তা, শিশিরকণা একটু ভাবলেন—শ্বেতার আপন দেওর তো নয়। আর যদি আপনও হতো, তাহলেও কী—

—লক্ষ্মী-তো শিশু, মিছিমিছি শরীরটাকে আরও খারাপ কোরো না। ওকে তো দেখেছ। সুন্দর ছেলে, খুব ভালো। ঝড়ের মতো ঘরে এসে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাঁচ বছরের স্বাতী—বাবা, শোনো...বলেই প্রকাণ্ড কান্না। কী রে, কী?—কোমরে হাত রেখে বীরের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো বিজু পিছন থেকে বলে উঠল—কিছু না বাবা, ছোড়দি কিনা ওর চকোলেটগুলি দেখতে চেয়েছিল একটু...

—না বাবা। চোখের জলে বাপের কোল ভিজিয়ে দিতে-দিতে স্বাতী বলল—না বাবা, কেড়ে নিয়েছে আমারটা—

—মিথ্যুক! হিংসুটি! দরজার কাছ থেকে বাবরি দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রঙিন ফ্রক পরা শাশ্বতী—সবটা নিয়ে কেঁদে হাট বাধানো চাই! তোকে তো আর দেয়নি—

তোমাকেই যেন দিয়েছে—রোদনের রন্ধ্র-পথে বেরিয়ে এলো স্বাতীর প্রত্যুত্তর। দিয়েছে তো সেজদিকে!—ঠিক বোঝা গেল না, বিজু কোন পক্ষের সৈনিক। বিজুর কথায় শিশিরকণা একটু চমকালেন। বললেন—সেজদিকে একটু ডেকে দিস তো বিজু।

দাও আমার চকোলেট! আনুনাসিক আর্তস্বর বের করল স্বাতী।—যাঃ! চাই না একটাও! আহ্লাদি মেয়ে! শাশ্বতীর লম্বা সাদা হাতটা ঝিলিক দিয়ে উঠল, আর মেঝের ওপর, ঠিক শিশিরকণার পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল চিকচিকে ম্যাজেন্টা আর সবুজ আর রুপোলি রাঙতায় মোড়া কয়েকটা চকোলেট। হঠাৎ বিজুর ছোট্ট শরীরে ডিগবাজি খাওয়ার মতো একটা ভঙ্গি হলো, চকিতে সব কটা কুড়িয়ে এক লাফে ঘর পার হলো সে, শাশ্বতী চিৎকার করে ছুটল তার পিছনে। স্বাতী অবিশ্রান্ত ঈঁ-ঈঁ করে কাঁদছে। রুগ্‌ণ শরীরে গর্জন গর্জন করে উঠলেন শিশিরকণা—স্বাতী, চুপ! সঙ্গে-সঙ্গে স্বাতীর গলা আর শোনা গেল না, কিন্তু কান্না উদ্বেল হলো দ্বিগুণ। চুপ, থামাও কান্না! মেয়েকে কাঁধের ওপর ফেলে রাজেনবাবু তাড়াতাড়ি চলে এলেন বারান্দায়। পায়চারি করতে-করতে মেয়ের কোঁকড়া-কোঁকড়া ঘন চুলের মধ্যে আস্তে আঙুল চালাতে-চালাতে গুনগুন করে বলতে লাগলেন—স্বাতী, আমার স্বাতী-সোনা, আর কাঁদে না...লক্ষ্মী-তো, মণি-তো, আর কাঁদে না...বাঃ, কী সুন্দর চোখ, দেখি, দেখি একটু...কী সুন্দর হাসি! সত্যি সুন্দর। সরস্বতীর চেয়েও সুন্দর চুল হয়েছে ওর। স্বাতী—বাড়ির ছোট-ছোট মানুষগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট, পাঁচটি সুন্দরীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, পাঁচটি মধুর নামের মধ্যে সবচেয়ে মধুর নাম। এ নাম তিনি তো ওর কোনো দিদিকেও দিতে পারতেন...সরস্বতীকে, কি শাশ্বতীকে; ভাগ্যিস দেননি, আর কাউকে মানাত না...নিজেরই অজান্তে এ নাম তিনি রেখে দিয়েছিলেন সবশেষের সবচেয়ে ভালোটির জন্য। স্বাতী শান্ত হলো, স্তব্ধ হলো, মাথাটি ভারী হলো কাঁধের ওপর। আহা, ঘুমিয়ে পড়ল...সারাদিন ছুটোছুটি দাপাদাপি করে...মার অসুখে কি আর ছেলেমেয়ের কোনো হাল থাকে! আমি আর কতটুকু পারি, সারাদিন তো আপিস। তাছাড়া বাপকে দিয়ে কি হয় এসব...হয় সব! একটু বেশি আহ্লাদি হয়েছে মেয়েটা, বড্ড আখুটে, জেদ—তা হবে না, জন্মে থেকে ও মাকে তো পায়ইনি বলতে গেলে। লুটিয়ে-পড়া চুল মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে ভিজে-ভিজে ঠাণ্ডা নরম ঠোঁটের ওপর একবার চুমু খেলেন রাজেনবাবু। তারপর আস্তে ঘরে নিয়ে এসে নিজের খাটে শুইয়ে দিলেন। শিশিরকণা শুয়ে ছিলেন চোখে হাত রেখে আলো আড়াল করে। না তাকিয়েই বললেন—ঘুমিয়ে পড়ল তো? একদিনও ওর খাওয়া হয় না রাত্রে—

হয়েছে হয়েছে—রাজেনবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—আমি ডেকে খাওয়াব এখন।

সারাদিনের খাটুনির পরে এই করো আরকি। ঈশ্বর!

তুমি ওরকম কোরো না তো, শিশু! আমার বেশ ভালোই লাগে এসব। চোখ থেকে হাত সরিয়ে ঘুমন্ত স্বাতীর দিকে একটু তাকিয়ে শিশিরকণা বললেন—এত যে সোহাগ করলে মেয়েদের নিয়ে, হলো কী তাতে? তিনটে ঢেঁকি-ঢেঁকি মেয়ে যে-বাড়িতে, সেখানে তোমার ঐ স্বাতী-সুন্দরীও কি আর ওদের চেয়ে ভালো হবে?

কী যে বলো তুমি! আমার মেয়েরা মন্দ! কী রে সরস্বতী? ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে সরস্বতী বলল—কী মা? ডেকেছিলে?

অনেক আগেই ডেকেছিলাম। মার কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারল না সরস্বতী। মিষ্টি করে একটু হাসল।

—চকোলেট কে দিয়েছে?

—অরুণদা তো!

—তোকে দিয়েছে?

—আগে একদিন মহাশ্বেতাকে দিয়েছিল কিনা, আজ আমাকে দিয়েছে। তা সকলে মিলেই তো খাই। কী সুন্দর বাক্সটা, দেখবে মা? এক ছুটে সরস্বতী নিয়ে এলো কাচের মতো কাগজে মোড়া মস্ত রঙিন বাক্স। মার হাতের কাছে বিছানায় রেখে বলল—দ্যাখো মা। শিশিরকণা গম্ভীর স্বরে বললেন—দেখছি তো। কেন দিয়েছে?

—কেন মানে?

—এরকম দেয় বুঝি মাঝে-মাঝে?

দিলে কী হয়? 'কী'-টাকে অনেকখানি টানল সরস্বতী, একটু আহ্লাদি ধরনে। সুন্দর, সরল, উজ্জ্বল মুখে এগিয়ে আসছে আশঙ্কার ছায়া, আবার তাকে হঠিয়ে দিচ্ছে আনন্দের অন্ধ বিশ্বাস। সেইদিকে তাকিয়ে শিশিরকণা হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলেন না। আর সেই সুযোগে রাজেনবাবু বললেন—কিছু হয় না যা। সরস্বতী মার দিকে একবার তাকাল। নিশ্বাস ফেলে শিশিরকণা বললেন—যা। অরুণকে একবার ডেকে দিস আমার কাছে।

সরস্বতী চলে যাওয়ামাত্র রাজেনবাবু ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন—অরুণকে আবার কেন? এই শরীর তোমার, তার মধ্যে—

চকোলেটের বাক্সটার অন্তত দশ টাকা দাম হবে, কী বলো?

পাগল! অত কী আর! আর হলেই বা কী—ভালো লাগে বলেই তো—

এসব ভালো-লাগা ভালো না।

যত তোমার! ওকে তুমি কিছু বলে বোসো না কিন্তু।

তুমি ভেবো না, আমি ঠিক কথাই বলব।